রাসুলের বাগিচায়

ফুটন্ত ফুল

বই : রাসুলের বাগিচায় ফুটন্ত ফুল
লেখক : আইনুল হক কাসিমী
প্রকাশনায় : রাইয়ান প্রকাশন

রাসুলের বাগিচায়

ফুটন্ত ফুল

আইনুল হক কাসিমী

রাইয়ান প্রকাশন

রাসুলের বাগিচায়

ফুটন্ত ফুল

প্রথম প্রকাশ

অক্টোবর : ২০২২

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

ইমেইল

raiyaanprokashon@gmail.com

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মার্জিন সলিউশন, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

বইমেলা পরিবেশক

নহলী

প্রচ্ছদ

সিদ্দীক মামুন

অঙ্গসজ্জা

সাবেত চৌধুরী

মুদ্রিত মূল্য

২৭৫/- টাকা

RASULER BAGICHAY FUTONTO FUL

Published by : Raiyaan Prokashon

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশের প্রতিলিপিকরণ, পুনর্মুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান, পিডিএফ প্রস্তুতকরণ, অন্য কোনো বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকায় প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দা'য়াহর স্বার্থে গ্রন্থের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চাইলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা জরুরি। উপরোক্ত শর্তাবলীর লঙ্ঘন শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ।

সূচিপত্র

শুরুর কথা ৯
গিরিগুহার সাথি ১১
ধনীর দুলাল ১৫
মায়ার বাঁধন ২০
এক মশক পানি ২৩
জান্নাতি খেজুর গাছ ২৬
নিদারুণ জঠরজ্বালা ৩১
ইমানের ফুলকি ৩৪
বৃদ্ধার তাঁবুতে ৩৬
মিসকিন গভর্নর ৩৮
ইমানের পরাকাষ্ঠা ৪২
আল্লাহর তরবারি ৪৮
খলিফার দরকষাকষি ৫১
উহুদের বীরাঙ্গনা ৫৪
জান্নাতি দুলহা ৬০
দরদিয়া পরাণ ৬৩
ছদ্মবেশী খলিফা ৭০
ইশকে রাসুল ৭৪
পুণ্যময়ী বধূ ৭৭
গোলামের প্রতিশোধ ৮০
সিজদায় আত্মাহুতি ৮১
জাহান্নামের ফেরারি ৮৩
সম্বলহীন গভর্নর ৮৮
নাজাশির দরবারে ৯০
দন্তহীন সুদর্শন ৯৪
ইমানের সওদা ৯৬
আজনাদাইনের রণবীর ১০০
প্রস্ফুটিত ইমান ১০৬
ক্রন্দসী বধূয়া ১১০

পতিপ্রাণা প্রিয়তমা.....১১৫
প্রজাবৎসল রাজা ১১৮
ধুলোমলিন সংসার ১২১
খুনি পুত্রসন্তান ১২৩
মহৎপ্রাণ খলিফা ১২৬
বুভুক্ষু বাঘিনী..... ১২৮
স্বপ্ন সুখের কুঁড়েঘর ১৩০
আরশওয়ালার প্রিয় ১৩২
কুৎসিত বরপুত্র..... ১৩৪
মহানুভব খলিফা ১৩৭
বেহেশতের খুশবু..... ১৩৯
বাঁধনহারা প্রিয়তম ১৪২
দয়াপরবশ খলিফা.....১৪৪
ব্যথিতের বেদন ১৪৬
জীর্ণবেশী সেনাপতি.....১৫১
খলিফার দূরদর্শিতা..... ১৫৮
সিদ্দিকের তাকওয়া ১৬০
ঈর্ষান্বিত সৌভাগ্যবান.....১৬১
খলিফার অনুশোচনা ১৬৩
বৃক্ষতলে ঘুমন্ত ১৬৫
জারজিস দুহিতা ১৮৪
ওরা দু'ভাই.....১৮৮
অকুতোভয়ী জননী..... ১৯০

শুরুর কথা

সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহ তাআলার, যিনি সৃষ্টি করেছেন গোটা বিশ্বজগৎ। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ ﷺ এর ওপর; যিনি নবি ও রাসুলকুলের সম্রাট। তদ্রূপ তাঁর সকল সঙ্গী ও সাথির ওপর। অতঃপর;

একটি বাগানে নানান রকম ফুল ফোটে। প্রতিটি ফুলেরই রঙ, রূপ, সৌন্দর্য ও সৌরভ হয় ভিন্ন। আর সেই ভিন্নতায় ফুলটি হয় অনিন্দ্যসুন্দর, অতুলনীয় ও মনোলোভা। কেউ গোলাপে মুগ্ধ হলেও বেলির শোভা ও সুবাস তাকে টানবেই। জুঁই, চামেলি, গাঁদা, শেফালি, হাসনাহেনা, রজনীগন্ধাও তার নজর কাড়বে। কারণ, প্রতিটি ফুলই নিজ গুণে অনন্য।

নবিজি ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামদের যদি একটি বাগিচার সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে নবিজি হবেন সেই বাগিচার গোলাপ, আর সাহাবাগণ হবেন সেই বাগিচায় গোলাপকে ঘিরে ফুটন্ত বেলি, জুঁই, চামেলি, হাসনাহেনা ও রজনীগন্ধা ফুলের মতো।

নবিজি ﷺ এর প্রিয় সাহাবায়ে কেরামদের অনুপম ইমান, উত্তম আমল, সুন্দর আখলাক ও সোনালি জীবনাচারের হৃদয়ছোঁয়া একগুচ্ছ গল্প নিয়েই রচিত হয়েছে এ বইটি। যদিও বাজারে সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে রচিত দেশি-বিদেশি গল্পের বই অনেক আছে, কিন্তু সাধারণত ওগুলোর মধ্যে গ্রহণযোগ্য তথ্যসূত্র থাকে না। এই শূন্যতার দিকে লক্ষ করেই বক্ষ্যমাণ বইটি তথ্যসূত্রের ফুলঝুরি দিয়ে সাজিয়েছি।

শিশু-কিশোর থেকে নিয়ে সব বয়সের পাঠকের জন্য উপযোগী করে লেখার চেষ্টা করেছি বইটি। এবং যথাসম্ভব সরস ও প্রাঞ্জল ভাষায়। প্রতিটি গল্পে মূল বিষয়ের প্রতিই মনোনিবেশ করেছি বেশি; সাহিত্য ও ভাষাশিল্পের খুব একটা খেয়াল করিনি। তা ছাড়া আমার সাহিত্য ও ভাষাশিল্প নেই বললেই চলে। ফলে বইটি আলেম, তালিবুল ইলম, জেনারেল পড়ুয়া—সকলের জন্যই উপযোগী। বিশেষ করে বইটি খতিব, বক্তা ও দায়িদের জন্য খুবই উপকারী হবে, ইনশাআল্লাহ।

অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বইটির কলেবর বড় হয়ে গেছে। কী করব বলুন; সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে রচিত কিতাবাদিতে ওসব হৃদয়ছোঁয়া গল্পের ভাণ্ডার ও কাহিনির সম্ভার পড়তে গেলে কোনটা রেখে কোনটা লিখি—এই অবস্থা হয়ে যায়! এজন্যই কলেবর বড় হয়ে গেছে! তবুও বেছে বেছে লিখেছি। অন্যথায় সাহাবায়ে কেরামদের ইমানদীপ্ত গল্পগুলো লিখতে হলে এরকম কয়েক ভলিউওমে হাজার হাজার পৃষ্ঠা লিখেও শেষ হবার মতো নয়!

বইটি যথাসম্ভব নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আল্লাহর কুরআন ব্যতীত যেহেতু আর কোনো গ্রন্থ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়; এবং মানবিক ত্রুটিবিচ্যুতি থাকাটা স্বাভাবিক, তাই আমার এ গ্রন্থেও 'ভুল' থাকা স্বাভাবিক। যেকোনো প্রকার ভুল ধরিয়ে দিলে শুধরিয়ে নেবার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ। এজন্য আপনাকে অগ্রিম 'জাযাকাল্লাহ' বলে রাখলাম।

দুটি শব্দের ছোট্ট ছোট্ট নান্দনিক শিরোনামে ৬১ টি গল্প দিয়ে সাজিয়েছি আমার এ বই। বলতে গেলে পুরোটি বই-ই একটি বাগিচা; যে বাগিচার ফুল আসহাবে রাসুল। একটি ফুলবাগানে ঢুকলে যেভাবে নানারঙা ফুলের শোভা ও সৌরভ আপনাকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, ঠিক এ বইটিও আপনাকে শুরু থেকে শেষ অবধি বিমোহিত করে রাখবে, ইনশাআল্লাহ—এটা আমার বিশ্বাস।

আইনুল হক কাসিমী
১২-১০-২০২২
রবিবার, বিকাল ৩ : ৫০

গিরিগুহার সাথি

গভীর রাত। মক্কার আকাশে তখন বসেছে তারার মেলা। পুরো নগরীটাই তখন নিঁদপুরী। এমন সময় নিজ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন একজন মহামানব। অত্যন্ত চুপিসারে। নিঃশব্দে। সন্তর্পণে। তিনি আর কেউ নন; তিনি হলেন পেয়ারা নবি মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ ﷺ। ইসলামের দাওয়াহ দেওয়ার কারণে ইতিমধ্যেই তিনি গোটা মক্কার মূর্তিপূজকদের চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছেন। তারা তাঁকে হত্যা করার জন্য তাঁর ঘর ঘেরাও করে আছে। কিন্তু অলৌকিক সাহায্যে তিনি তাদের চোখে ধূলা দিয়ে বেরিয়ে এসেছেন।

জন্মভূমি মক্কা একেবারে ছেড়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। অবশ্য নিজ ইচ্ছায় নয়; সাত আসমানের মালিক আল্লাহর হুকুমে। ঐশী হুকুমে তাঁকে মক্কা ছাড়তে হচ্ছিল ঠিক; কিন্তু জন্মভূমির টানে তাঁর কলিজা ছিঁড়ে যাচ্ছিল! যাবার সময় ভালোবাসার এক অদৃশ্য মায়ায় তিনি বার বার পেছনে ফিরে তাকাতে লাগলেন। তাঁর মন বলছিল—হায় মাতৃভূমি! যেতে নাহি চাই, তবুও যে যেতে হয়!

রাতের আঁধারে এ মক্কার রাস্তা দিয়ে তিনি আরও কতই তো হেঁটেছেন। কত পরিচিত মক্কার সব অলি-গলি। কিন্তু কখনোই এ প্রিয় শহরটাকে আজকের মতো এত অসহায় মনে হয়নি তাঁর কাছে। কিন্তু আজ কী হলো তাঁর; বুকটা যেন ফেঁটে যাচ্ছে বিচ্ছেদের বেদনায়। কতদিনের জন্য এ শহর ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে—কে জানে! এটাকেই বুঝি 'ভালোবাসা' বলে! তিনি এক পা সামনে আগান আর পিছন ফিরে তাকান। মনে মনে বলেন, 'বিশ্বাস করো, ওরা যদি আমাকে তোমার বুক থেকে বের করে না দিত, তাহলে কখনোই তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।'

আঁখি ছলছল হয়ে তিনি আবারও সামনে বাড়েন। হাঁটতে হাঁটতে তিনি মক্কার মাটিতে তাঁর সবচেয়ে কাছের বন্ধুটির বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়ান। যে বন্ধুর সাথে তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবন কেটেছে। ইমানের দাওয়াত শুরু করার প্রাথমিক ওই কঠিন মুহূর্তেও যে বন্ধুটি তাঁর বাণীকে কোনোরূপ দ্বিধাবোধ ব্যতিরেকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। যে বন্ধুটি এতদিন তাঁর পাশে ছায়ার মতো লেগে

থেকেছেন। বাড়ির দরজায় এসে কড়া নাড়তে না নাড়তেই খুলে গেল দরজা! আশ্চর্য হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করেন,

'ব্যাপার কী, আবু বকর! তুমি ঘুমাওনি?'

'ইয়া রাসুলুল্লাহ! যেদিন থেকে আপনার মুখে হিজরতের কথা শুনেছি, সেদিন থেকেই তৈরি হয়ে আছি। রাতকে হারাম করে দিয়েছি—কখন আপনি আসেন তাই। আর সফরের জন্য দুটি উটনিও খরিদ করে লালন-পালন করে আসছি।'

'চলো; এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে।'

তখনও আকাশের তারাগুলো ঠিক আগের মতোই জ্বলজ্বল করছিল। দেরি না করে, সকলের অলক্ষে আবু বকরের বাড়ির পেছনের জানালা দিয়ে বেরিয়ে পড়েন দুই বন্ধু। যেভাবেই হোক; সূর্য উঠার আগেই ছাড়তে হবে মক্কার মাটি। চলে যেতে হবে শত্রুদের নাগালের বাইরে।

দুই বন্ধু মক্কার পথ বেয়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। যাতে রাতের অন্ধকার থাকতেই তাঁরা মক্কা নগরীর বাহিরে চলে যেতে সক্ষম হন। কারণ, রাসুল জানতেন যে, কুরাইশগণ তাঁকে দেখতে না পেলে সর্বশক্তি দিয়ে তাঁর সন্ধানে লেগে পড়বে এবং সর্বপ্রথম যে রাস্তায় দৃষ্টি দেবে, তা হচ্ছে মদিনার কর্মব্যস্ত রাস্তা—যা উত্তর দিকে গেছে। এ জন্য তাঁরা সেই পথে যেতে থাকলেন, যে পথটি ছিল সেই পথের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। সেটা ছিল ইয়েমেন যাওয়ার পথ—যা মক্কার দক্ষিণদিকে অবস্থিত ছিল।

জ্যোৎস্নারাতে এ পথ ধরে পাঁচ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে মক্কার সাওর পর্বতের পাদদেশে গিয়ে তাঁরা পৌঁছলেন। এ পর্বতটি ছিল খুবই উঁচু। পর্বতশীর্ষে আরোহণের পথ ছিল আকা-বাঁকা ও দুর্গম। আরোহণের ব্যাপারটিও ছিল খুব কষ্টসাধ্য। পর্বতের এখানে-ওখানে ছিল প্রচুর ধারালো পাথর, যা রাসুল ﷺ-এর পদযুগলকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলছিল।

পর্বতে উঠতে গিয়ে নবিজি পদচিহ্ন গোপন করার জন্য আঙুলের উপর ভর দিয়ে চলতে লাগলেন। এতে তাঁর পা জখম হয়ে পড়ল। নবিজির এমন কষ্টসাধ্য মুহূর্তে এগিয়ে এলেন প্রিয় বন্ধু। আবু বকরের সহায়তায় নবিজি পর্বতের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছলেন।

সাওর পর্বতের শীর্ষদেশে আরোহন করেলেন দুজনে। কিন্তু ততক্ষণে মক্কার পূব আকাশ রাঙিয়ে উদিত হয়েছে সূর্য। ইতিমধ্যেই হয়তো কাফিররা তাঁদের দুজনের খোঁজে বেরিয়ে গেছে। দিনের আলোয় মক্কা ছাড়া উচিত হবে না। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন—আপাতত পর্বতের কোনো গুহা বা খাঁজে আশ্রয় নেবেন। আত্মগোপন করবেন। পরে সুযোগ বুঝে বেরিয়ে পড়বেন।

গগনচুম্বী পর্বত। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পাথরের পর পাথর। জায়গাটায় কখনও কোনো মানুষের ছোঁয়া লেগেছে বলেও মনে হয় না। দুই বন্ধু দাঁড়িয়ে আছেন। ভাবছেন—কীভাবে আশ্রয় নেবেন পর্বতের গুহায়। পেছনে আছে শত্রু। এদিকে সময়ও বেশি নেই। এতকিছুর পরও নবিজির চেহারায় চিন্তার লেশমাত্র নেই। ভাবলেশহীন কণ্ঠে নবিজি আবু বকর ﵁-কে ডেকে বলেন,

‘আবু বকর! চলো এখানেই কোনো গুহা খুঁজে নিই।’

‘হ্যাঁ, ইয়া রাসুলুল্লাহ।’

নবিজি ﷺ জুতা খুলে ফেললেন। আবু বকর ﵁-এর হাতে দিয়ে পায়ের এক কোণ দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। তিনি এ কৌশল অবলম্বন করলেন এজন্য, যাতে এখানেও তাঁদের কোনো পদচিহ্ন না থাকে।

পর্বতের কন্টকাকীর্ণ পথ পেরিয়ে অবশেষে তাঁরা একটি গুহা খুঁজে পেলেন। আবু বকর ﵁ চিন্তিত কণ্ঠে আরজ করলেন,

‘ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি আগে যাবেন না; বরং আমি আগে প্রবেশ করে ভালোভাবে দেখে নিই—এখানে অসুবিধাজনক কিছু আছে কিনা; তারপর নাহয় আপনি প্রবেশ করুন।’

‘ঠিক আছে।’

আবু বকর ﵁ গুহায় প্রবেশ করলেন। পুরো গুহায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। সেখানে অনেকগুলো সাপের গর্ত দেখে তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন। এখানে থাকলে তো সাপ-বিচ্ছুর দংশন খেতে হবে! সমূহ বিপদ এড়াতে তিনি নিজের কাপড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে গর্তের মুখগুলো বন্ধ করে নিলেন। তবুও দুটো গর্ত বাকি থেকে যায়। বিপাকে পড়েন আবু বকর ﵁। এগুলো কীভাবে বন্ধ করা যায়—ভাবতেই তাঁর মাথায় এক বুদ্ধি এলো। নিজের পা দিয়ে তিনি বন্ধ করে রাখেন ছিদ্রদুটি।

এবার আর কোনো চিন্তা নেই। প্রাণাধিক প্রিয় বন্ধু নবিজিকে ডাকা যায়। গুহা থেকে মুখ বের করে ডাকেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! দয়া করে গুহায় প্রবেশ করুন।' দোস্তের কথামতো গুহায় ঢুকলেন নবিজি। শরীরে দীর্ঘ সফরের ধকল। ক্লান্তিতে তিনি দোস্তের কোলেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। বন্ধু আবু বকর ﵁ জেগে থাকেন। তিনি দুচোখের পাপড়ি এক করেন না একটি মুহূর্তের জন্যও। যদি প্রিয় নবির কিছু দরকার হয়—তাই।

গর্তের মুখে পা রেখে, নবিজিকে কোলে নিয়ে বসে আছেন আবু বকর। হঠাৎ গর্তের ছিদ্র দিয়ে একটি সাপ দংশন করল আবু বকরের পায়। মুহূর্তেই বিষে তাঁর পুরো শরীর নীল হয়ে গেল। তিনি দাঁতে দাঁত পিষে বিষক্রিয়া সহ্য করে যেতে চাইলেন। তবুও ছিদ্রের মুখ থেকে পা সরাননি—যদি এতে প্রিয় মানুষটির ঘুম ভেঙে যায়! যদি তিনি কষ্ট পান! কিন্তু এভাবে আর কতক্ষণ। একসময় বিষক্রিয়া সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। সইতে না পেরে তাঁর অজান্তেই দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল নবিজির চেহারা মুবারকে। ঘুম ভেঙে লাফিয়ে উঠেন নবিজি। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, 'আবু বকর! তোমার চোখে পানি কেন?'

'আমার মা-বাবা আপনার জন্য কুরবান হোক—ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাকে বিষাক্ত সাপ দংশন করেছে।'

'তুমি আমাকে ডাক দিলে না কেন?'

'আপনার ঘুমে ব্যঘাত ঘটবে—তাই ডাক দিইনি।'

অবাক হয়ে রাসুল ﷺ দেখলেন তাঁর প্রিয় বন্ধুকে। অন্ধকার গর্তে আবিষ্কার করলেন এক নবিপ্রেমিক মহান মানুষকে। খুশিতে তাঁর বুকটা ভরে ওঠল। দ্রুত নিজের পবিত্র লালা মুবারক লাগিয়ে দিলেন দংশিত স্থানে। ব্যস, নবিজির পবিত্র থুথুর পরশে দ্রুত সেরে উঠলেন আবু বকর ﵁। অবস্থা এমন হয়ে গেল যে, আবু বকরের পায়ে যেন কখনও কোনো সর্প দংশন করেইনি! সাওর পর্বতগুহায় দুই বন্ধু তিন রাত অবস্থান করলেন। এরপর পা বাড়ালেন মদিনার পথে।[১]

[১] ফাতহুল বারি : ৭/৩৩৬; সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৫৩-৫৫৪; আস-সিরাতুন-নাবাবিয়্যাহ : ২/৩৪২; রাহমাতুল্লিল আলামিন : ১/৯৫।

ধনীর দুলাল

মুসআব বিন উমাইর ﵁। রাসুল ﷺ-এর গোষ্ঠীর এক যুবক। মুসআবের বাবা উমাইর ছিলেন রাসুলের পরদাদা হাশিমের ছেলে। সে হিসেবে মুসআবের সাথে নবিজির সম্পর্ক ছিল চাচা-ভাতিজার সম্পর্ক। মুসআব ছিলেন কুরাইশের শাহজাদা। বলতে গেলে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছেন তিনি। বিত্তবৈভব ও প্রাচুর্যের অধিকারী ছিল তাঁর পরিবার। ছোটবেলা থেকেই তিনি আরাম-আয়েশেই বড় হন। জীবনে দুঃখ ও কষ্ট বলতে কিছুই জানতেন না।

তিনি তাঁর বাবা-মায়ের ঘরে ছিলেন একলা। তাঁর আর কোনো ভাই-বোন ছিল না। তিনিই ছিলেন তাঁর বাবা-মায়ের স্বপ্ন। তিনিই ছিলেন তাদের সব। বলতে গেলে আলালের ঘরের দুলাল। বাবা ও মায়ের নিবিড় পরিচর্যার মধ্য দিয়ে তিনি বড় হন এবং সীমাহীন আদূরে ও আহ্লাদে হয়ে উঠেন। কিন্তু কুরাইশের এই শাহজাদার জীবনে হঠাৎ নেমে এলো ঘোর অমানিশা। তিনি হয়ে গেলেন আমির থেকে ফকির!

তখন মক্কায় নতুন এক বিপ্লব শুরু হয়েছে। ইমানের বিপ্লব। শিরকের বিরুদ্ধে এক আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত। এই দাওয়াত নিয়ে এসেছেন মক্কার সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ও বিশ্বস্ত যুবক মুহাম্মাদ ﷺ। মক্কার প্রভাবশালী মুশরিকরা এই দাওয়াতের বিরোধিতায় কোমর বেঁধে নেমেছে। কিন্তু মক্কার দুর্বল শ্রেণির মানুষেরা বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো এই দাওয়াত গ্রহণ করতে শুরু করেছে।

ততদিনে মক্কার আরকাম ইবনে আবিল আরকামের ঘর তাওহিদের আস্তানায় রূপান্তরিত হয়েছে। শিরক ছেড়ে তাওহিদের দিকে আসা মুসলিমদের চেতনার বাতিঘর ছিল এই ঘর। তারা লুকিয়ে এখানে সমবেত হতেন। নবিজির মুখ থেকে দীনের মহাবাণী শুনতেন। যারা ইসলাম গ্রহণ করতে চাইতেন, তারা চুপিসারে এখানে আসতেন।

মুসআব বিন উমায়ের কিন্তু কুরাইশের আরও দশজন যুবকের মতো ছিলেন না। তিনি সমাজের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে মুহাম্মাদুর রাসুল ﷺ-এর অন্ধবিরোধিতায় মাঠে নেমে পড়েননি; বরং স্রোতের বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে থেকে সত্যানুসন্ধান

করে যেতে লাগলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁরই বংশীয় এই লোকের আনিত মহাবাণী সত্য। তাই তিনি সেই মহাবাণীকে গ্রহণ করতে আগ্রহী হলেন।

একদিন গোপনে দারুল আরকাম ইবনে আবিল আরকামে উপস্থিত হয়ে ইসলামগ্রহণ করে নিলেন। কিন্তু তাঁর মা ও সমাজ এটা মেনে নেবে না—এই ভয়ে তিনি তাঁর ইসলাম গোপন রাখলেন। কিন্তু তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটা বেশিদিন গোপন থাকেনি। একদিন তিনি গোপনে নামাজ পড়ছিলেন। ইত্যবসরে সেই দৃশ্য দেখে ফেলে মক্কার এক মুশরিক উসমান বিন তালহা আবদারি। এবং সে মুসআবের মাকে অবহিত করে।

ব্যস, মুসআবের ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে তাঁর মা তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠল। সে তার কলিজার টুকরা মুসআবকে নির্যাতন করতে শুরু করে। খানাপিনা বন্ধ করে দেয়। বাড়ির অন্ধকার কুঠুরিতে বন্দি করে রাখে। যাতে মুসআব মুহাম্মাদ ﷺ এর সংস্পর্শে যেতে না পারেন। কুরাইশের এই শহাজাদা এতই কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন যে, নির্যাতন ও বঞ্চনার আতিশয্যে সাপের গা থেকে খসে পড়া খোলসের মতো তাঁর শরীরের চামড়া খুলে খুলে পড়তে শুরু করেছিল!

রাসুলের মহাবাণীর ওপর ইমান আনয়নকারীদের ওপর তখন মক্কায় নির্যাতন সীমাহীন হয়ে যায়। ফলে রাসুল ﷺ নির্যাতিতদেরকে সুদূর ইথিওপিয়ায় গিয়ে ন্যায়পরায়ণ খ্রিষ্টান বাদশাহ নাজাশির দেশে আশ্রয় নিতে বললেন। নবিজির আদেশ পেতেই মক্কার নওমুসলিমদের মধ্যে ইথিওপিয়ায় হিজরত করার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। কিন্তু মুসআব বিন উমাইর যাবেন কীভাবে? তিনি তো তাঁর মায়ের কাছে গৃহবন্দি!

মুসআবের একজন প্রতিবেশিনী ছিলেন লাইলাহ বিনতে আবি হাসমাহ রা। তাঁর কাছে আসেন নবিজি। এসে বলেন, 'মুসআব হিজরত করে যেতে চায় ইথিওপিয়ায়; কিন্তু তাঁর মা তাঁকে বন্দি করে রেখেছে।' আমির বিন রাবিআহ বলেন, 'আমরা মুসআবের জন্য অপেক্ষা করেত লাগলাম। এজন্য আমরা আমাদের ঘরের খিল লাগাইনি। যখন রাত হলো, মুসআব কৌশল করে পালিয়ে এলেন তাঁর মায়ের বন্দিশালা থেকে। সে রাত তিনি আমাদের ঘরেই থাকেন। পরদিনও থাকেন। সেদিন রাতে তিনি আমাদের সাথে ইথিওপিয়ায় হিজরত করার জন্য মক্কা ছাড়েন।'

মুসআবের গায়ের চামড়া ছিল বড় পাতলা। আদরের দুলাল বলে কথা। জীবনে তিনি পয়দল সফর করতে অভ্যস্ত ছিলেন না। কিন্তু ইথিওপিয়ায় হিজরতের সময় তাঁকে পয়দল সফর করতে হয়। কারণ, সফরের জন্য তাঁর সাথে কোনো বাহন ছিল না।

এমনকী তাঁর পায়ে কোনো জুতাও ছিল না। খালি পায়ে হাঁটার কারণে তাঁর পা ফেটে রক্ত বের হতে শুরু করে। এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে আমির বিন রাবিআ নিজের জুতা খুলে মুসআবকে দিয়ে দেন।

জিদ্দায় লোহিত সাগরের উপকূলে পৌঁছার পর দেখা গেল, আফ্রিকার মৌরিতানিয়া থেকে পণ্য বোঝাই একটি নৌকা নোঙর করেছে। মৌরিতানিয়া হয়ে ইথিওপিয়ায় হিজরতের উদ্দেশ্যে সকলেই সে নৌকাটি ভাড়া করে নিলেন। মাথাপিছু সকলকেই অর্ধেক দিনার ভাড়া পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু কুরাইশের শাহজাদা মুসআবের হাতে এক কানাকড়িও ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে দয়াপরবশ হলেন আমির বিন রাবিআ। তাঁর সাথে ১৫ দিনার ছিল। তিনি মুসআবের ভাড়া পরিশোধ করে সাথে নিয়ে গেলেন।

পরবর্তীকালে ইথিওপিয়া থেকে মক্কায় ফিরে এলেন মুসআব। কিন্তু তখনও মক্কার পরিস্থিতি খারাপ ছিল। মুসলিমদের ওপর মুশরিকদের নির্যাতন আগের চেয়ে আরও বেশি ছিল। নবিজির নির্দেশে মুসআব মদিনায় হিজরত করেন। মদিনা তখন ক্রমশ ইসলামের তীর্থভূমি হতে শুরু করেছে। মদিনায় গিয়ে মুসআব বিন উমাইর মদিনার নওমুসলিমদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতে লাগলেন। বনু আবদির-দারের আসআদ ইবনে জুরারাকে নিয়ে তিনি সেখানে ইসলামপ্রচার করেন। তাঁর হাতেই ইসলাম গ্রহণ করেন মদিনার আউস খাজরাজ গোত্রের মোড়ল গোছের অনেক ব্যক্তি।

মদিনার আউসের অন্যতম মোড়ল সাদ বিন মুআজ মুসআব বিন উমাইরের ওপর খেপে গেলেন। তার কাছে খবর পৌঁছল যে, আসআদ ইবনে জুরারাহর ছত্রছায়ায় মুসআব ইবনে উমাইর আউস ও খাজরাজদের মধ্যে নতুন দীনের দাওয়াত ছড়াচ্ছেন। সাদ বিন মুআজ বর্শা ও তলোয়ারসহ উপস্থিত হলেন মুসআব বিন উমাইরের সামনে। ভিনদেশী এই অপরিচিত আগন্তুক কেন এখানে এসে লোকদের ধর্মান্তরিত করছেন—এই হুমকি দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

পরে আবারও তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, মুসআব রীতিমতো তাঁর দাওয়াত ছড়িয়ে যাচ্ছেন। এবার আগের চেয়ে আরও তেলেবেগুনে জ্বলে এলেন সাদ বিন মুআজ। কিন্তু এবার আসআদ ইবনে জুরারাহ তাঁকে শান্ত হয়ে মুসআবের কথা শুনতে বললেন। সাদ বিন মুআজ নিশ্চুপ শুনলেন। মুসআব সাদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনালেন। আল্লাহ সাদের অন্তরের ইমানের আলো জ্বালিয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি এখানে ইসলামের কথা প্রকাশ না করে নিজ গোত্র বনু আবদিল আশহালে পৌঁছে জনসম্মুখে ইসলাম ঘোষণা করেন।

সাদ বিন মুআজ বনু আবদিল আশহালকে ইসলামগ্রহণের দাওয়াত দেন। নেতার দাওয়াতের প্রভাবিত হয়ে বনু আবদিল আশহালের সবার প্রায়ই ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। আনসারদের মধ্যে আউসের এই পুরো গোষ্ঠীই ইসলাম গ্রহণ করে। এরইমধ্যে বনু নাজ্জার মুসআবকে তাড়িয়ে দেয়। এমনকি তারা আসআদ ইবনে জুরারাহর ওপরও খেপে যায়। ফলে মুসআব ইবনে উমাইর সাদ ইবনে মুআজের আশ্রয়ে চলে যান। এবং আগের চেয়ে আরও জোরদারভাবে ইসলামপ্রচার করতে থাকেন। মদিনার আনসারদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ইসলাম ছড়াতে থাকে। আনসারদের বড় বড় ব্যক্তিবর্গ মুসলিম হতে শুরু করেন। নবিজিও খুশি হন মুসআবের এমন কর্মকাণ্ডে।

একদিন আসআদ ইবনে জুরারাহর উপস্থিতিতে মুসআব বিন উমাইর ইসলামের কথা বলছিলেন। ওই সময় ক্রোধে ফেটে পড়ে এসে উপস্থিত হলেন বনু আবদিল আশহালের সরদার উসাইদ ইবনে হুজাইর। তাঁর অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, মক্কা থেকে আগত ধর্মান্তকারী এই লোকটার আজ একটা বিহিত করে ছাড়বেন। কিন্তু উসাইদের এই ক্রোধান্বিত অবস্থা একটুও বিচলিত করল না মুসআবকে; তিনি বরং মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন,

‘উসাইদ! আপনি কি বসে আমার কথা শুনবেন না? আমার কথা পছন্দ হলে আমাদের দীন মানবেন, নইলে আমরা আপনার পছন্দের বাইরে গিয়ে এই দীনের প্রচার করব না।’

‘আপনি ইনসাফপূর্ণ কথাই বলেছেন।’

এই কথা বলেই নিজের বর্শা মাটিতে গেঁথে বসে পড়লেন উসাইদ ইবনে হুজাইর এবং মুসআবের কথা শোনার জন্য কান পেতে দিলেন। মুসআব বিন উমাইরের কুরআন তিলাওয়াত এবং ইসলামের কথা যত শুনতে থাকলেন উসাইদ, তত তার চেহারা উজ্জ্বল হতে লাগল। মুসআব তিলাওয়াত ও ওয়াজ থেকে অব্যাহতি নিতে পারেননি; অমনি উসাইদ ইবনে হুজাইর শাহাদাত পাঠ করে সবার সামনেই ইসলাম গ্রহণ করলেন।

উসাইদ ইবনে হুজাইরের ইসলাম গ্রহণের খবর মদিনায় বিজলির ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। এতে খুশিতে উদ্বেলিত হয়ে আসেন আউসের মোড়ল সাদ ইবনে মুআজ। খাজরাজের মোড়ল সাদ ইবনে উবাদাহও মুসলিম হয়ে যান। আনসারের আরেক

সরদার আমর ইবনে জামুহও মুসলিম হন। এভাবে মুসআবের দাওয়াতে মদিনার মাটিতে ইসলামের শিকড় প্রোথিত হয়ে যায়। যা নবিজির হিজরতকে তরান্বিত করে।

শুধুমাত্র ইসলামের জন্য আমির থেকে ফকির হওয়া মুসআব বিন উমাইরের জীবনযাপন ছিল বড় মানবেতর। একদিন নবিজি দেখতে পেলেন, মুসআব ভেড়ার চামড়া গায়ে জড়িয়ে আছেন। তাঁর এই রিক্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করে নবিজির বড় দয়া লাগল। তিনি বললেন, 'এই যুবকটার প্রতি লক্ষ করে দেখো, যার অন্তর আল্লাহ আলোকিত করেছেন। সে তাঁর মা-বাবার এতই আদরের দুলাল ছিল যে, তাঁর মা-বাবা তাঁকে সুস্বাদু খাবার ও মিষ্ঠ পানীয় খাওয়াতে দেখেছি। আমি তো তার গায়ে দুইশো দিনার মূল্যের জামা পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ভালোবাসা তাঁকে আজকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে—যা তোমরা দেখতেই পাচ্ছো!'

উহুদের যুদ্ধে মুসআব বিন উমাইর ছিলেন ঝাণ্ডাবাহী। কাফির সৈন্য ইবনে কামআ লাইসি তাঁর ডান হাতে আঘাত করে। হাত কেটে যায়। ঝাণ্ডা বাম হাতে ধরেন মুসআব। এবার বাম হাতেও আঘাত করে ইবনে কামআ লাইসি। বাম হাতও কেটে যায়। দাঁত দিয়ে মুসআব কামড়ে ধরেন পতাকা। কিন্তু এবার ইবনে কামআ লাইসি মুসআবের পেটে বর্শাঘাত করে। উটের পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে যান মুসআব। ইসলামি ঝাণ্ডা ভূলুণ্ঠিত হয়ে যায়। সাথে মুসআবও শহিদ হয়ে যান।

উহুদের শহিদ মুসআব বিন উমাইর এতোটাই রিক্ত ছিলেন যে, তাঁর পরিধেয় চাদরটা তাঁর কাফন হবার জন্য যথেষ্ট ছিল না। চাদর দিয়ে মাথা ঢাকলে পা উন্মুক্ত হয়ে যেত, আর পা ঢাকলে মাথা উন্মুক্ত হয়ে পড়ত। অবশেষে রাসুলের নির্দেশে চাদর দিয়ে মুসআবের মাথা ঢেকে দেওয়া হলো, আর পায়ের ওপর ইজখির ঘাস ছড়িয়ে দেওয়া হলো।[২]

[২] রাহমাতুল্লিল আলামিন : ১/৫৭; তালকিহুল ফুহুম : ৬১; আস-সিরাতুন-নাবাবিয়্যাহ : ১/৩১৭, ইবনে হিশাম হিময়ারি; উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস-সাহাবাহ : ৫/৪৯, ইবনুল আসির; জামেউত-তিরমিজি, হাদিস : ৩০২৭, ইমাম আবু ইসা তিরমিজি।

মায়ার বাঁধন

প্রিয়নবি ﷺ ছিলেন এমন এক মহামানব, যার মধ্যে ভালোবাসার সব কয়টি গুণ পরিপূর্ণভাবেই বিদ্যমান ছিল। যদ্দরুণ যে একবার তাঁর সান্নিধ্যে চলে আসত, সে আর তাঁর সংস্রব ছাড়তে চাইত না; তাঁর ভালোবাসার অদৃশ্য বাঁধনে আটকে যেত। মা-বাবা, ভাই-বোন, গৃহ-পরিবার, প্রেয়সী-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন—সকলের ভালোবাসার চেয়েও রাসুলের ভালোবাসা থাকত ঊর্ধ্বে।

বস্তুত তিনি ছিলেন এমন উন্নত চরিত্রের অধিকারী, যার কথা, কাজ, আচরণ, ব্যবহার—সবই ছিল অতুলনীয়। তাঁর অনুপম চরিত্রমাধুর্য সবাইকে মুগ্ধ করত। তাঁকে ভালোবেসে কত মানুষের মন যে বিগলিত হয়েছে—তার ইয়ত্তা নেই। তাঁকে কাছে পেয়ে অনেকেই তাঁর জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। এঁদেরই একজন ছিলেন জায়েদ বিন হারিসা ﵁। তাঁর পিতা হারিসা বিন শারাহিল ধর্মবিশ্বাসে ছিলেন খ্রিষ্টান।

জায়েদ বিন হারিসা তখন খুব ছোট ছিলেন। দেখতে চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দর। ছিলেন আপন মায়ের কলিজার এক টুকরো। জায়েদকে বুকে জড়িয়ে রাখতেন তাঁর মা। সোনামণিকে আদর করে মায়েরা যেমন প্রাণ জুড়ায়, জায়েদের মায়ের অবস্থাও ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু জায়েদকে বেশিদিন আদর করার ভাগ্য মায়ের হয়ে ওঠেনি; একটি দুর্ঘটনা এসে কেড়ে নেয় আদরের দুলালকে তার বুক থেকে!

একদিন জায়েদের মা জায়েদকে নিয়ে বনু মাআন গোত্রে তার বাপের বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছিলেন। আরব দেশের মরুময় পথ। সে জামানায় মরুপথে যাতায়াত ছিল সীমাহীন কষ্টকর। তখন সূর্যের প্রচণ্ড তাপ মাথায় নিয়ে চলতে হতো। তা ছাড়া মরুদস্যুর উপদ্রব তো ছিলই। দস্যুরা মরুভূমির ফাঁক-ফোকরে ওত পেতে বসে থাকত। সুযোগ পেলেই এরা অকস্মাৎ পথচারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং লোকজনের সর্বস্ব লুট করে নিত। অনেক সময় দস্যুরা লোকজনকে বন্দি করে নিয়ে যেত। এসব বন্দিকে তারা ক্রীতদাস হিসেবে হাট-বাজারে নিয়ে বিক্রি করে দিত।

জায়েধ ও তাঁর মায়ের ভাগ্যেও ঘটল একই ঘটনা। তারা বনু কাইন গোত্রের দস্যুদের হাতে পড়লেন। মরুদস্যুরা তাদের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেল। ছোট বালক জায়েদসহ অনেককে দস্যুরা বন্দি করল। একদিন জায়েদকে বিক্রি করে দেওয়া হলো মক্কার প্রসিদ্ধ উকাজ নামক বাজারে। এ সুযোগে হাকিম ইবনে হিজাম নামে এক লোক জায়েদকে কিনে নিলেন। এ সময় জায়েদের বয়স ছিল মাত্র আট বছর।

হাকিম ইবনে হিজাম ছিলেন খাদিজা ﵂-এর আপনজন। হাকিমের ফুফু তিনি। হাকিম জায়েদকে এনে খাদিজার হাতে সমর্পণ করলেন। খাদিজা ﵂ ছিলেন আরবের সুন্দরী, সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য এক মহিয়সী নারী। তাঁর ঘরে অনেক দাস-দাসী কাজ করত। আরও কাজের লোক চাই তাঁর। তাই জায়েদকেও তিনি কাজের জন্য রেখে দিলেন। খাদিজার ঘরে বালক জায়েদ বড় হতে লাগলেন। জায়েদ ছিলেন খুব বিশ্বস্ত ও কর্মঠ।

চল্লিশ বছর বয়সে মহিয়সী খাদিজার সাথে প্রিয়নবি ﷺ-এর বিয়ে হলো। তিনি হয়ে গেলেন প্রিয়নবির প্রিয়তমা। এবার খাদিজা বালক জায়েদকে স্বামীর খেদমতে নিয়োগ করলেন। নবিজির সান্নিধ্য পেয়ে জায়েদ তো মহাখুশি। আল্লাহর নবির সাথে থাকা যে বড় ভাগ্যের ব্যাপার। ভাগ্যবান না হলে কেউ আল্লাহর নবির এ কাছের জন হতে পারত না। খাদিজা ﵂ যেমন জায়েদকে ভালোবাসতেন, তেমনি নবিজিও তাঁকে আদর করতেন।

ছোটবেলা থেকে জায়েদ মা-বাবার তেমন একটা আদর পাননি। তাতে কী? তিনি খাদিজার কাছে মায়ের চেয়েও বেশি আদর পেয়েছেন। আর এখন নবিজির কাছে পেলেন বাবার আদর। ফলে তাঁর আনন্দ ও সুখ আর কে দেখে? এমনি করে জায়েদের দিনগুলো সুখে-আনন্দে ভালোই কাটছিল। নবিজির খেদমত আর ইসলামের কাজ ছাড়া তাঁর কোনো ভাবনা নেই। নেই কোনো পিছুটানও।

তবে একদিন ঘটল এক ঘটনা। আরবের বনু কিলাব গোত্রের একদল হজযাত্রী কাবাঘর জিয়ারত করতে মক্কায় এলো। তাদের সাথে জায়েদের দেখা হলে যাত্রীদের একজন জায়েদকে চিনে ফেলল। সে নিশ্চিত হলো, এই বালকই হারিসার হারানো পুত্র জায়েদ। তাই তারা বিষয়টি হারিসাকে জানাবে বলে ভাবল। হজ সেরে তারা বাড়িতে ফিরে হারিসাকে ঠিকই সবকথা খুলে বলল। প্রাণপ্রিয় পুত্র জায়েদের খবর শুনে বাবা হারিসার বুক খুশিতে লাফিয়ে উঠল। তাই কালবিলম্ব না করে তিনি তার ভাই কাব বিন শারাহিলকে নিয়ে তড়িঘড়ি করে মক্কায় হাজির হলেন।

হারিসা খোঁজখবর নিয়ে সোজা নবিজির বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। সেখানে হারিসা ঠিকই তার হারানো ধন জায়েদকে দেখতে পেলেন। অনেকদিন পর প্রাণাধিক পুত্রের মুখ দেখে হারিসার চোখ বেয়ে নেমে এলো আনন্দাশ্রু। তিনি নবিজিকে বললেন, ‘হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তান! হে হাশিমের সন্তান! হে কুরাইশের বিশ্বস্ত মানব! জায়েদ আমার ছেলে, বুকের ধন, ও আমার হারিয়ে যাওয়া মাণিক। আমি তাকে নিতে এসেছি। জায়েদকে দয়া করে ফিরিয়ে দিন। এ জন্য যা মূল্য চান, আমি তা দিতে প্রস্তুত আছি। আপনি তো মহামানব। তাই না করবেন না। আমার ছেলে আমাকে ফিরিয়ে দিন।’

‘এটাই সিদ্ধান্ত, নাকি অন্যকিছু হতে পারে?’

‘তাহলে আর কী হতে পারে?’

‘আগে জায়েদকে ডাকুন; তাকে ছাড়প্রদান করুন—সে যদি আপনাদের সাথে চলে যেতে যায়, তাহলে আমি কোনো বাধা দেব না; আর যদি সে যেতে না যায়। তাহলে আপনারা তাঁকে জোর করতে পারবেন না।’

‘আপনি ভালোই বলেছেন।’

জায়েদের বাবা ও চাচা মনে করেছিলেন তাদের ছেলে তাদেরকেই প্রাধান্য দেবে; তাদের সাথে যেতে চাইবে, তাই এমন কথা বলেছিলেন। যাক, নবিজি জায়েদকে ডাকলেন। জায়েদ এলে জিজ্ঞেস করলেন,

‘এই দুজনকে কী তুমি চেনো?’

‘জী, ইনি আমার আব্বা আর উনি আমার চাচা।’

‘আমাকে তো তুমি চেনো ও জানো এবং তোমার সাথে আমার সম্পর্ক কী—তাও জানো, এবার তুমি হয়তো আমাকে গ্রহণ করো অথবা এই দুজনকে গ্রহণ করো।’

‘আমি ইনাদের চাই না; আমি আপনার ওপর অন্য কাউকে গ্রহণ করতে পারব না। আপনিই আমার বাবা ও চাচা—সবই!’

‘তোমার ধ্বংস হোক, হে জায়েদ! তুমি কি স্বাধীনতার চেয়েও গোলামি পছন্দ করো? তোমার পরিবার-পরিজনের চেয়েও অন্য লোকদের প্রাধান্য দিতে চাও?’

‘হ্যাঁ, আমি নবিজির থেকে এমন গুণ ও আচরণ লক্ষ করেছি, যদ্দরুণ উনার ওপর আর কাউকে আমি প্রাধান্য দিতে পারব না!’

আল্লাহর নবি যখন জায়েদের এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করলেন, তখন তাঁকে নিয়ে হিজর নামক জায়গায় এলেন। এখানে সে সব লোকদের সাক্ষ্য রেখে বললেন, ‘হে লোক সকল! তোমরা জেনে রেখো—আজ থেকে জায়েদ আমার পুত্র; সে আমার উত্তরাধিকারী হবে আর আমি তাঁর উত্তরাধিকারী হব।’

এই অভাবনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করে জায়েদের বাবা ও চাচার অন্তর জুড়িয়ে গেল। তারা সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় নিয়ে নিজ গোত্র বনুল কাইনে ফিরে গেলেন![৩]

[৩] আস-সিরাতুন-নাবাবিয়্যাহ : ১/২৪৮, ইমাম ইবনে হিশাম হিময়ারি; উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস-সাহাবাহ : ২/২৫০, ইমাম ইবনুল আসির; আত-তাবাকাতুল-কুবরা : ৩/৪২, ইমাম ইবনে সাদ; তারিখু মাদিনাতি দিমাশক : ১৯/৩৪৮, ইবনে আসাকির; আল-ইসিতআব ফি মারিফাতিল-আসহাব : ২/৫৪৫ ইবনু আবদিল বার; আর-রাউজুল উনুফ : ২/২৯১, সুহাইলি; আল-ইসাবাহ ফি তাময়িযিস-সাহাবাহ : ১/২৯৭, ইবনে হাজার আসকালানি।

এক মশক পানি

ইয়ারমুক—ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী একটি স্থান। বর্তমান জর্ডানের ইয়ারমুক নদের নিকটবর্তী এই ঐতিহাসিক জায়গাটি। হিজরি ১৫ সালের ৫ ই রজব মোতাবেক ২০ আগস্ট ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ইয়ারমুকের ময়দানে শুরু হয়ে যায় কুফর ও ইমানের রক্তক্ষয়ী এক ঐতিহাসিক লড়াই। খিলাফতের আসনে তখন সমাসীন হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁। তাঁর শাসনামলে আরব উপদ্বীপ ছাড়িয়ে ক্রমবর্ধমান ইসলামের সীমানা দিনের পর দিন শুধু বিস্তৃত হতে ছিল বাইজেন্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের ভূমিতে।

৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস নাগাদ মুসলিম বাহিনী শামের প্রতিটি লড়াইয়ে বাইজেন্টাইনদের হারাতে হারাতে পশ্চিম শামের হিমস শহর দখল করে নিয়েছিল। পুরো শামে কেবল আলেপ্পো তখন বাইজেন্টাইনদের একমাত্র শক্তিশালী ঘাঁটি—যা হারালে তাদের শামের দাঁড়ানোর মতো আর জায়গা থাকবে না। এমন কঠিন অবস্থায় বাইজেন্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াস যেন চোখে শর্ষেফুল দেখতে পেলেন। অবস্থার ভয়াবহতা আঁচ করতে পেরে তিনি মুসলিমদের পরাজিত করতে চিরশত্রু পারস্য সাম্রাজ্যের সাথে ঐক্যজোট গড়ার পর মুসলিমদের ওপর চূড়ান্ত হামলা করার জন্য বাইজেন্টাইনীয়, আর্মেনীয়, স্লাভ, জর্জিয়ান, ফ্রেঞ্চ এবং আরব খ্রিষ্টান যোদ্ধাদের একত্রিত করে বিশাল এক বাহিনী তৈরি করলেন।

ঐতিহাসিকদের মতে, এ যুদ্ধের জন্য হিরাক্লিয়াস প্রায় ১লাখ ৫০হাজারের বেশি যোদ্ধার এক বিশাল বাহিনী তৈরি করেন। বিশাল এই বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া হয় থিওডোর ট্রিথিরিয়াসকে। তবে বৃদ্ধ থিওডোরের সহযোগী হিসেবে আর্মেনীয় বংশোদ্ভূত দুর্ধর্ষ বাইজেন্টাইন কমাণ্ডার মাহানকে নিযুক্ত করা হয়। মুসলিমদের পক্ষে সেনাপতি ছিলেন চারজন। এঁদের অন্যতম ছিলেন হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ ﵁।

কিন্তু দেড় লাখ সৈন্যের এ বিশাল বহরকে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে মাত্র ছত্রিশ বা চল্লিশ হাজার মুসলিম সৈন্যের বাহিনী। যুদ্ধে বাইজেন্টাইনদের ৭০হাজার সৈন্য অক্কা পায়, বাকিরা লেজ গুটিয়ে পালায় কনস্টান্টিনোপলের পথে! বাইজেন্টাইন সেনাপতি থিওডোর ট্রিথিরিয়াস ও মাহান—দুজনেরই মরা লাশ পড়ে থাকে ইয়ারমুকের প্রান্তরে! অন্যদিকে মুসলিমদের চার হাজার মুজাহিদের রূহ জান্নাতের সবুজ পাখি হয়ে উড়াল দেয় ঊর্ধ্বজগত পানে।

এখানেই শেষ নয়; মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ ﵁ তাঁর বিশেষ প্রশিক্ষিত মুজাহিদদের সাথে নিয়ে খ্রিষ্টানদের পিছু নিলেন এবং অন্য কমান্ডারদেরও নির্দেশ দিলেন—খ্রিষ্টানদের যেন তাড়িয়ে তাড়িয়ে হত্যা করা হয়। কেননা, এরা অন্য কোথাও গিয়ে একত্রিত হয়ে মুসলমানদের ওপর আবার হামলা করবে। আশ্চর্য হলেও সত্য যে, দেড়শো কিলোমিটার পর্যন্ত খ্রিষ্টান যোদ্ধাদের নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ না দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যায় মুসলিম বাহিনী।

অবশেষে শ্বাসরুদ্ধকর এই লড়াইয়ের অবসান হয়। কুফরের পরাজয় আর ইমানের বিজয় ঘটে। আহতদের গোঙানি আর আর্তনাদে ইয়ারমুকের ময়দান তখনও বিভীষিকাময়! ইয়ারমুকের মাঠে জায়গায় জায়গায় জমাটবদ্ধ রক্তের মাঝে অসংখ্য অগনিত লাশ আর লাশ! প্রায় সবগুলোই বাইজেন্টাইন খ্রিষ্টানদের। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে খ্রিষ্টানদের কর্তিত, খণ্ডিত ও ছিন্নভিন্ন মরদেহ! অদূরে বৃক্ষের ডালে ডালে অপেক্ষারত চিল শকুন আর কাকের ডাকে পরিবেশটা আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে!

আবু জাহম বিন হুজাইফা ﵁ ছিলেন আল্লাহর রাসুলের একজন সাহাবি। তিনি যুদ্ধ শেষে বের হলেন চাচাতো ভাইয়ের খোঁজে। হাতে এক মশক পানি নিয়ে। উদ্দেশ্য—অন্তিম মুহূর্তে হলেও চাচাতো ভাইয়ের মুখে উঠিয়ে দেবেন একফোঁটা পানি। কাঠের মতো শুকনো দুটো ঠোঁট ভিজিয়ে দেবেন একফোঁটা শীতল পানির পরশে। শীতল পানিতে সিক্ত দুটো ঠোঁট দিয়ে যাতে শেষমেশ কালেমাহ পাঠ করে মোলাকাত করতে পারেন আপন মাওলার।

আবু জাহম বিন হুজাইফা হাঁটছেন আর আহত নিহতদের সারিতে তাঁর চাচাতো ভাইকে খুঁজছেন। মশক ভরতি পানি টলোমল আর তাঁর চোখদুটো অশ্রুসজল। খুঁজতে খুঁজতে তিনি তাঁর ভাইকে পেয়ে গেলেন। ইয়ারমুকের রক্তাক্ত প্রান্তরে তাঁর ভাই তখন মুমূর্ষু অবস্থায় মৃত্যুযন্ত্রনায় কাতরাচ্ছেন। চাচাতো ভাইকে পানির মশক হাতে আসতে দেখে তিনি ইশারায় পানি চাইলেন।

আবু জাহম তাঁকে পানি দিতে গেলেন। এমন সময় পাশে থেকে 'আহ' শব্দ ভেসে এলো! আবু জাহম তাকিয়ে দেখেন হিশাম ইবনে আস ﵁ জখমে জখমে জর্জরিত হয়ে মৃত্যুযন্ত্রনায় কাতরাচ্ছেন! আবু জাহমের চাচাতো ভাই পানি পান না করেই হিশাম ইবনে আসের দিকে নিয়ে যেতে ইঙ্গিত করলেন!

চটজলদি হিশাম ইবনে আসের নিকট পৌঁছে গেলেন আবু জাহম। হিশামের মুখে পানির মশক ধরতে যাবেন—ঠিক তখন পাশে থেকেই আবারও ভেসে এলো 'আহ' শব্দ! হিশাম পানি পান না করেই সেদিকে পানি নিয়ে যেতে ইশারা করলেন! আবু জাহম পানির মশক নিয়ে দৌড় দিলেন সেদিকেই।

আবু জাহম বিন হুজাইফা যখন পানি নিয়ে তাঁর পাশের জনের নিকট পৌঁছলেন, দেখলেন ইতোমধ্যেই তাঁর রূহ ইহজগত ছেড়ে চলে গেছে! তিনি ফিরে এলেন হিশাম ইবনে আসের কাছে। কিন্তু হায়, হিশামও ততক্ষণে চলে গেছেন প্রভুর সান্নিধ্যে!

উৎকণ্ঠিত আবু জাহম এবার ফিরে এলেন তাঁর চাচাতো ভাইয়ের কাছে। ভাইয়ের মুখে পানির মশক ধরতে যাবেন—কিন্তু হায়! এ কী; চাচাতো ভাইও যে আর এ জগতে নেই; বিদায় নিয়েছেন দুনিয়া থেকে!

জল টলোমল মশক নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন আবু জাহম বিন হুজাইফা দুঃখভারাক্রান্ত মনে। অন্তিম মুহূর্তে একফোঁটা পানি মুখে তুলে দিতে পারলেন না চাচাতো ভাইয়ের মুখে! পারলেন না বাকি দুজনেরও মুখে! তিন তিনজন মানুষ আহ আহ বলে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল, আর মশকভর্তি পানি তাঁর হাতেই রয়ে গেল![৪]

[৪] আওজাযুল মাসালিক ইলা মুওয়াত্তা মালিক : ৯/৯৮৪, হাদিস : ৪৮৪; কিতাবুজ-জুহদ, হাদিস : ৫১৩, ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক; আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ : ৭/৯২, ইমাম ইবনে কাসির; তারিখুর-রুসুল ওয়াল মুলুক : ৩/৪০২, ইমাম ইবনে জারির তাবারি; ফুতুহুল বুলদান : ১/১৪০, ইমাম আহমাদ বালাজুরি; তাতিম্মাতু আযওয়ায়িল বায়ান : ১/১৬৫, শাইখ আবু আতিয়্যাহ মুহাম্মাদ সালিম।

জান্নাতি খেজুর গাছ

মদিনা ছিল খেজুর বাগানে ঘেরা জনপদ। মদিনায় এতবেশি খেজুর ছিল যে, বৃষ্টির কারণে কোনো খেজুর নিচে পড়লে এটা কোন গাছের খেজুর—তা নির্ণয় করা ছিল দুরূহ ব্যাপার। এরূপ বাগানকে কেন্দ্র করে সাহাবিদের মধ্যে কোনো কোনো সময় বিতর্কের সৃষ্টি হতো। সমাধানের জন্য তাঁরা নবিজির কাছে যেতেন এবং সঠিক সমাধান পেতেন। এক্ষেত্রে অন্যান্য সাহাবিগণ তাঁকে সহযোগিতা করতেন।

মদিনায় একটি খেজুর বাগান ছিল। এটির মালিক ছিল এক এতিম বাচ্চা। তার বাগানের সাথে অন্য এক লোকেরও একটি বাগান ছিল। ওই লোকের নাম ছিল আবু লুবাবা। এতিম নিজের জমির সীমানা বরাবর প্রাচীর নির্মাণ করে বাগানটি আলাদা করে নিতে চাইল, যাতে প্রত্যেকের অংশ পৃথক হয়ে যায়। যখন প্রাচীর দিতে শুরু করল, তখন দেখা গেল তার প্রতিবেশীর একটি খেজুরগাছ প্রাচীরের সীমানার আওতায় এসে যাচ্ছে। যার কারণে প্রাচীরটি সোজা হচ্ছে না। তাই সে তার প্রতিবেশীর নিকট গিয়ে বলল,

‘আপনার বাগানে অনেক খেজুর গাছ। আমি একটি প্রাচীর দিতে চাচ্ছি, কিন্তু আপনার একটি খেজুর গাছের কারণে প্রাচীরটি সোজা হচ্ছে না। ওই গাছটি আমাকে দিয়ে দিন, তাহলে আমার প্রাচীরটি সোজা হয়ে যাবে। এতে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না।’

‘আল্লাহর কসম! আমি খেজুরগাছটি দান করব না।’

‘ভাই! আপনার তো কোনো ক্ষতি হবে না। হয় আপনি গাছটি দান করুন; আর নাহয় আমার কাছ থেকে এর মূল্য নিয়ে নিন।’

‘আল্লাহর কসম! আমি এর কোনোটাই করব না।’

এতিম ছেলেটি তাকে বুঝানোর চেষ্টা করল। প্রতিবেশীর অধিকারের কথা বলল। কিন্তু সে ছিল দুনিয়াপ্রেমিক। তাই না সে এতিমের অসহায়ত্বের প্রতি লক্ষ্য করল, আর না প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি। এতিম বলল,

‘তাহলে কি আমি আর প্রাচীর দেব না আর তা সোজাও করব না?’

‘এটা তোমার ব্যাপার। এ ব্যাপারে আমার কিছুই করার নেই।’

এতিম যখন তার কথায় নিরাশ হলো, তখন সে চিন্তা করল যে, এমন একজন ব্যক্তি আছেন যদি তিনি সুপারিশ করেন, তাহলে হয়তো আমার কাজ হতে পারে। একথা মনে করে সে মসজিদে নববির দিকে রওনা হলো। সে মসজিদে নববিতে এসে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আরজ করল,

‘হে আল্লাহর রাসুল! আমার বাগান অমুক ব্যক্তির বাগানের সাথে মিশে আছে। আমি এর মাঝে প্রাচীর দিতে চাচ্ছি। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত প্রাচীর সোজা হচ্ছে না, যতক্ষণ না আমার প্রতিবেশীর একটি খেজুর গাছ আমার দখলে আসবে। আমি তার মালিককে বলেছি যে, এটি আমার নিকট বিক্রি করে দাও। আমি তাকে যথেষ্ট বুঝানোরও চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে তা অস্বীকার করছে। হে আল্লাহর রাসুল! আমার জন্য তার নিকট একটু সুপারিশ করুন, যাতে সে আমাকে ওই খেজুরগাছটি দিয়ে দেয়।’

‘যাও! তাকে ডেকে নিয়ে এসো।’

এতিম তার নিকট গিয়ে বলল, আল্লাহর রাসুল ﷺ আপনাকে ডেকেছেন। আবু লুবাবাব নামের ওই লোকটি মসজিদে নববিতে এলো। নবিজি তার দিকে তাকিয়ে বললেন,

‘সে দেয়াল দিয়ে তোমার বাগান থেকে তার বাগান পৃথক করতে চায়। তোমার একটি খেজুরগাছের কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। তুমি তোমার ভাইকে ওই খেজুর গাছটি দিতে নাকি অস্বীকার করেছ?’

‘হ্যাঁ।’

‘গাছটি তোমার ভাইকে দিয়ে দাও।

‘আমি দেব না।’

‘তোমার ভাইকে ওই খেজুরগাছটি দিয়ে দাও। আমি তোমার জন্য জান্নাতে একটি খেজুরগাছের দায়িত্ব নেব।’

‘না আমি তা দেব না।’

এত করে বুঝানোর পরেও যখন লোকটি নবিজির কথার কোনো গুরুত্ব দিলো না, তখন তিনি চুপ হয়ে গেলেন। এরচেয়ে বেশি তিনি তাকে আর কী বলতে পারেন! এদিকে সাহাবায়ে কেরামগণ নিশ্চুপ থেকে কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিলেন আর আশ্চর্যবোধ করছিলেন।

উপস্থিত লোকদের মধ্যে আবুদ-দাহদাহ নামের একজন সাহাবি ছিলেন। মদিনায় তাঁর খুব সুন্দর একটি খর্জূরবিথিকা ছিল। সেখানে ৬০০ খেজুরগাছ ছিল। সুস্বাদু খেজুরের কারণে বাগানটি মদিনায় খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। এ বাগানের খেজুর ছিল খুব উন্নতমানের এবং বাজারে তার যথেষ্ট চাহিদাও ছিল। মদিনার বড় বড় ব্যবসায়ী এ কামনা পোষণ করত—হায়, যদি বাগানটি আমার হতো!

আবুদ-দাহদাহ ওই বাগানের মধ্যে খুব সুন্দর করে একটি বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। স্বপরিবারে তিনি সেখানে বসবাস করতেন। মিষ্টি পানির কূপ এ বাগানের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি করেছিল। আবুদ-দাহদাহ যখন নবিজির কথা শুনছিলেন, তখন মনে মনে ভাবছিলেন—এ দুনিয়া কী? আজ নয় তো কাল মৃত্যুবরণ করতেই হবে। এরপর শুরু হবে চিরস্থায়ী জীবন, যা স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে, না দুঃখে ভরপুর হবে—কে জানে? যদি জান্নাতে একটি খেজুরগাছ পাওয়া যায়, তাহলে আর কী চাই? এমন চিন্তা থেকেই সামনে এসে আবুদ-দাহদাহ রা. বললেন,

‘হে আল্লাহর রাসুল! যে কথা আপনি বললেন, এটা কি শুধু তার জন্যই নির্দিষ্ট? আমি যদি ওই ব্যক্তির কাছ থেকে খেজুর গাছটি ক্রয় করে এ এতিমকে দিয়ে দিই, তাহলে আমিও কি জান্নাতে খেজুর গাছের মালিক হব?’

‘হ্যাঁ, তোমার জন্যও জান্নাতে খেজুর গাছ থাকবে।’

আবুদ-দাহদাহ ভাবতে লাগলেন—এমন কী সম্পদ আছে, যা আমি ওই ব্যক্তিকে দিয়ে খেজুরগাছটি ক্রয় করব। তিনি ভেবে দেখলেন—মদিনায় তাঁর একটি বাগান আছে। যেখানে ছয়শো খেজুর গাছ, পানির কূপ ও একটি বাড়ি আছে। এগুলোর বিনিময়ে ওই গাছটি কিনে এতিমকে দিয়ে দেব। তিনি ওই ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললেন,

‘শোনো! তুমি কি আমার বাগান সম্পর্কে অবগত আছো, যেখানে ৬০০ খেজুরগাছ আছে, সাথে ঘর ও কুয়াও আছে?’

‘মদিনাতে এমন কে আছে, যে আপনার বাগান সম্পর্কে জানে না?’

‘তাহলে তুমি আমার ওই সম্পূর্ণ বাগান গ্রহণ করে তোমার একটি খেজুরগাছটি আমাকে দিয়ে দাও।’

ওই ব্যক্তি আবুদ-দাহদাহের প্রস্তাবটা যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে আবুদ-দাহদাহর দিকে ফিরে তাকাল। অতঃপর লোকজনের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তোমরা লক্ষ করো, আবু দাহদাহ কী বলছে?’

লোকজন যখন তার কথার ব্যাপারে সাক্ষী হলো, তখন সে বলল, ‘হ্যাঁ আমি তোমার খেজুরগাছের বাগান গ্রহণ করলাম এবং ওই খেজুরগাছটি তোমাকে দিয়ে দিলাম।’

আবুদ-দাহদাহ যখন ওই খেজুর গাছের মালিক হয়ে গেলেন, তখন এতিম ছেলেটাকে বললেন, ‘এখন থেকে ওই খেজুরগাছটি তোমার। আমি তা তোমাকে উপহার হিসাবে দিলাম। এখন তোমার দেয়াল সোজা করতে আর কোন বাঁধা নেই।’

এরপর আবুদ-দাহদাহ রাসুল ﷺ-এর দিকে তাকিয়ে বললেন,

‘হে আল্লাহর রাসুল! এখন আমি কি জান্নাতে খেজুরগাছের মালিক হলাম?’

‘আবু দাহদাহর জন্য জান্নাতে এখন কত বিশাল বিশাল খেজুরের বাগান অপেক্ষা করছে!’

শেষে আবুদ-দাহদাহ সেখান থেকে বের হলেন। জান্নাতে বাগানের সুসংবাদ পেয়ে নিজের বর্তমান বাগানের পথে রওনা হলেন। মনে মনে বললেন, নিজের ব্যবহারিক কিছু কাপড় এবং কিছু জরুরি জিনিসপত্র তো ওখান থেকে নিতে হবে। তিনি বাগানের দরজায় এসে ভেতরে বাচ্চাদের কণ্ঠ শুনতে পেলেন। তাঁর স্ত্রী তখন ঘরের কাজে ব্যস্ত ছিলেন আর বাচ্চারা খেলাধুলা করছিল। ভিতরে গিয়ে তিনি স্ত্রীকে সংবাদ দিতে চাইলেন। কিন্তু তিনি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন, ‘হে উম্মে দাহদাহ!’

উম্মে দাহদাহ অত্যন্ত অবাক হলেন যে, আজকে আবুদ-দাহদাহ বাগানের বাইরে দরজায় কেন দাঁড়িয়ে আছেন; ভিতরে আসছেন না কেন! আবারও আওয়াজ এলো—

‘উম্মে দাহদাহ!’
‘আমি উপস্থিত হে আবুদ-দাহদাহ!’

‘বাচ্চাদেরকে নিয়ে এ বাগান থেকে বের হয়ে আসো।’
‘আমি বাগান হতে বের হয়ে আসব?’
‘হ্যাঁ, আমি এ বাগান বিক্রি করে দিয়েছি।’

‘আপনি কার নিকট এটা বিক্রি করেছেন? কে কত দাম দিয়ে এটা ক্রয় করেছে?’

‘আমি জান্নাতে একটি খেজুর বাগানের বিনিময়ে তা বিক্রি করে দিয়েছি।’

‘আল্লাহু আকবার। হে আবুদ-দাহদাহ! আপনি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা করেছেন। জান্নাতের একটি বৃক্ষ, যার নিচে অশ্বারোহী একশত বছর পর্যন্ত চলার পরেও তার ছায়া শেষ হবে না!’

এই আবুদ-দাহদাহ ﵁-এর মূল নাম ছিল সাবিত ইবনুদ-দাহদাহ। তিনি মদিনার বনি আনিফ গোত্রভুক্ত একজন আনসারি সাহাবি ছিলেন। একেবারে শুরুলগ্নে মদিনায় হিজরত করে মুসআব বিন উমাইর ﵁ যখন ইসলামের দাওয়াহ ছড়াতে থাকেন, তখন আবুদ-দাহদাহও মুসআবের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন।

উহুদের রণাঙ্গনে ইমানের ফুলকি দেখান আবুদ-দাহদাহ ﵁। সেদিন যখন মুসলমানেরা রাসুল ﷺ-এর মৃত্যুর গুজবে দিশেহারা হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন, সেই কঠিন মুহূর্তেও যাদের পা একটুও নড়েনি, তাদের অন্যতম ছিলেন আবুদ-দাহদাহ। সে সময় তিনি বলেছিলেন, ‘হে আনসার সম্প্রদায়! যদি মুহাম্মাদ নিহত হয়ে থাকেন, তবে আল্লাহ জীবিত আছেন, তিনি মরেন না। তোমরা তোমাদের দীনের জন্য যুদ্ধ করো। কেননা আল্লাহ তোমাদের বিজয় দানকারী ও সাহায্যকারী।’

তাঁর ইমানি তেজোদীপ্ত কথা শুনে একদল আনসার সাহাবা উঠে দাঁড়ালেন এবং নবোদ্যমে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তখনও খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, আমর ইবনুল আস ও ইকরিমা বিন আবু জাহল প্রমুখ কাফির ছিলেন। আবুদ-দাহদাহ আনসারদের নিয়ে খালিদ বিন ওয়ালিদের বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে বসেন। কিন্তু খালিদ বিন ওয়ালিদের বর্শার আঘাতে আবুদ-দাহদাহ মাটিতে পড়ে যান এবং শাহাদতবরণ করেন। তাঁর সঙ্গীরাও খালিদের বাহিনীর হাতে শহিদ হন। এঁরাই ছিলেন উহুদের যুদ্ধের শেষ দিকের শহিদ।[৫]

[৫] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩২৫১; মাজমাউয-যাওয়াইদ, হাদিস : ১৫৭৯১-৯৩; মুসতাদরাক হাকিম, হাদিস : ২১৯৪; সিলসিলাতুস-সাহিহাহ, হাদিস : ২৯৬৪; আল-মুজামুল কাবির, হাদিস : ৭৬৩; শুআবুল ইমান, হাদিস : ৩৪৫১; সিফাতুস-সাফওয়াহ : ১/৬১৬, ইমাম ইবনুল জাওযি;

নিদারুণ জঠরজ্বালা

তখন দুপুরের কাঠফাটা রোদ। সূর্য যেন অগ্নিবর্ষণ করছে। প্রচণ্ড তাপে আরবের বালুকাময় প্রান্তর আর পাথুরে জমিন একেবারে উত্তপ্ত। তাপের দাবদাহে মদিনার প্রকৃতি ও পরিবেশ জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। এরকম সময়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন হজরত আবু বকর ﵁। মসজিদে নববির দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। পথেই দেখা হয়ে গেল তাঁর উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁-এর সাথে। আবু বকর ﵁-কে আসতে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন,

‘এই গরমের মধ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে এলেন যে?’

‘কী করব? দুঃসহ ক্ষুধা তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে আমাকে বাড়ি থেকে।’

‘হে আবু বকর, আমি নিজেও যে একই কারণে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছি!’

দুজনে কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ দেখলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ এগিয়ে আসছেন তাঁদের দিকে। আবু বকর ও উমরকে দেখে রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজেই কথা তুললেন,

‘কী ব্যাপার, এই অসময়ে কোথায় যাচ্ছো তোমরা?’

‘ইয়া রাসুলুল্লাহ! ক্ষুধার কষ্টই আমাদের বাড়ি থেকে বের করে এনেছে!’

‘সেই পবিত্র সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আমিও যে একই কারণে বের হয়ে এসেছি ঘর থেকে! চলো, সামনে যাই।’

তিনজন মিলে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলেন আবু আইয়ুব আনসারি ﵁-এর বাড়ি। আবু আইয়ুব ﵁-এর স্বভাব ছিল, প্রতিদিন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য খাবার তৈরি করে অপেক্ষা করা। রাসুল ﷺ না এলে বাড়ির সবার সাথে সেই খাবার ভাগাভাগি করে খেতেন আবু আইয়ুব আনসারি ﵁।

আল-মাগাজি : ১/২৮১, ইমাম ওয়াকিদি; আর-রাহিকুল মাখতুম : ১/২৪১, শাইখ সাফিউর-রাহমান মুবারকপুরি।

সেদিনও অপেক্ষা করছিলেন তিনি। কিন্তু রাসুল ﷺ খাবারের সময় না আসায় তিনি সবাইকে নিয়ে খাওয়া শেষ করে বাহিরে গিয়েছিলেন। খাবার শেষ হয়ে গেছে।

এদিকে রাসুল ﷺ তাঁর দুই সঙ্গী আবু বকর ও উমরকে নিয়ে এলেন। নবিজি আবু আইয়ুব আনসারি ﷺ-এর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন,

'আবু আইয়ুব কোথায় গিয়েছেন?'

'বাহিরে গিয়েছেন। এখনই এসে পড়বেন।'

ঠিক তখনই হজরত আবু আইয়ুব আনসারি ﷺ এককাঁদি কাঁচা-পাকা ও আধা পাকা খেজুর নিয়ে এলেন। রাসুল ﷺ বললেন,

'এত খেজুর আনতে গেলেন কেন? শুধু পাকা খেজুর আনলেই পারতেন!'

'সব ধরণের খেজুর পেশ করেছি, যেটা ভালো লাগে গ্রহণ করবেন। অনেক সময় পাকা খেজুরের চেয়ে আধা পাকা খেজুর মজা লাগে।'

তিনি তাড়াতাড়ি একটি বকরি জবাই করে নিলেন। কিছুটা গোশত আগুনে পুড়লেন আর বাকিটুকু ভুনা করা করলেন। আবু আইয়ুব ﷺ-এর স্ত্রী রুটি তৈরি করে নিলেন ইতিমধ্যে। এরপর মেহমানদের সামনে খাবার পরিবেশন করা হলো।

রাসুলুল্লাহ ﷺ খেতে গিয়ে হঠাৎ করেই থেমে গেলেন! তারপর একটি রুটির উপরে কিছু ভুনা গোশত রেখে সেটি আবু আইয়ুব আনসারি ﷺ-এর হাতে দিয়ে বললেন, 'একটু আমার মেয়ে ফাতিমার কাছে দিয়ে এসো এই খাবার। অনেক দিন হয়— আমার মেয়ে এমন খাবার খায় না!'

আবু আইয়ুব আনসারি ﷺ ফাতিমা ﷺ-কে খাবার দিয়ে ফিরে এলেন। নবিজি তাঁর দুই প্রিয় সাথিকে নিয়ে খাবার খেলেন। খাবার শেষে খাবারের দিকে তাকিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'রুটি, গোশত, খুরমা, পাকা ও আধপাকা খেজুর!'

এটুকু বলতেই গলা ধরে এলো নবিজির। দুচোখ ভর্তি পানি নিয়ে আবার কথা বললেন রাসুলুল্লাহ ﷺ, 'মহিমান্বিত আল্লাহ পাকের কসম, এই সবই হচ্ছে সেই নিআমত, যার ব্যাপারে তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে।' অতঃপর তিনি সুরা আত-তাকাসুরের ৮ নং আয়াতটি পাঠ করলেন—

﴿ثُمَّ لَتُسۡـَٔلُنَّ يَوۡمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ﴾

"এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নিআমত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"

এত কষ্টের পর খাবার খেয়ে হিসেবের কথা শুনে সাহাবিগণ অবাক হয়ে বললেন,

'এই খাবারেরও হিসেব দেওয়া লাগবে ইয়া রাসুলুল্লাহ!'

'তোমরা যখন কোনো নিআমত গ্রহণ করার জন্য হাত বাড়াবে, তখন "বিসমিল্লাহ" বলবে। তারপর তৃপ্তি নিয়ে খাবার শেষ করার পরে বলবে, "আল-হামদুলিল্লাহিল্লাযি হুয়া আশবাআনা ওয়া আনআমা আলাইনা ওয়া আফদ্বালা।"

এরপর বললেন, 'তাহলে এই দুআ আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের জন্য যথেষ্ট হবে।'[৬]

[৬] হায়াতুস-সাহাবাহ : ১/৫১৫–৫১৮, শাইখ ইউসুফ কান্ধলবি; সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবাহ : ১/১২৪–১৩০, আবদুর রাহমান রাফআত পাশা।